পরিবেশ বিদ্যা

পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সম্পাদক

ড. রূপা দাশগুপ্ত

সহ সম্পাদক

পার্থপ্রতিম প্রামানিক, ড. বিপ্লব দত্ত

ড. শত্রুঘ্ন কাহার, অভিষেক মুসিব

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA

পরিবেশবিদ্যা: পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সম্পাদক

ড. রূপা দাশগুপ্ত

সহসম্পাদক

পার্থপ্রতিম প্রামানিক

ড. বিপ্লব দত্ত

ড. শত্রুঘ্ন কাহার

অভিষেক মুসিব

ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

গঙ্গারামচক, চকশ্যামপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর– ৭২১১২৪

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA
FACULTY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION

Dr. Sankar Kumar Acharya
Dean PG Studies, BCKV
Professor and Fellow, ISEE, ICAR-IARI,
Former Head of the Department, BCKV,
Former Director, DEE, BCKV,
Former Member: Agriculture Commission
WB; Fellow, WAST

P.O. - Krishi Viswavidyalaya
Nadia, West Bengal, PIN - 741252
Phone: 9674419142
Website: www.bckv.edu.in
Email: acharya09sankar@gmail.com

Ref. No. – Ext/Communication/13-24

To,

Dr. Rupa Das Gupta

Principal

Debra Thana Shahid Kshudiram Smriti Mahavidyalay

Dear Dr. Das Gupta,

This is indeed a great pleasure to learn that Debra Thana Shahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya is publishing a book on, Environmental Science: Observation and Appraisal, which reflects team work, collective thinking and ecological responsibility of your learned faculties. I want to congratulate the editor of this book, Dr Rupa Das Gupta, Principal, co-editors and all authors of this book. This book is being published at a time when the planet is worst hit by global warming, soil and biodiversity erosion, increasing heavy metal toxicity in dwindling ground water reserve across the globe.

Kudos to this great endeavour, and I wish a huge response from the global audience of this book.

Prof. (Dr.) Sankar Kumar Acharya

Date: 23.07.2024

Paribeshbidya: Paryabekshan O Pryalochana (পরিবেশবিদ্যা: পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা) edited by Dr. Rupa Dasguta & others

© Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyala

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৪

প্রচ্ছদ: সমরেশ সেন

পেজ সেট-আপ: ড.বিপ্লব দত্ত
কম্পোজ: সমরেশ সেন, মেদিনীপুর

দাম: ৩০০ টাকা

ISBN : 978-81-969027-5-9

ড. রূপা দাশগুপ্ত, প্রিন্সিপ্যাল, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়-এর পক্ষে গঙ্গারামচক, চকশ্যামপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর— ৭২১১২৪ থেকে প্রকাশিত

বিষয়সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়		১-৩
পরিবেশবিদ্যাচর্চার নানা দিক ও পর্যায়	সৌম্যকান্তি ঘোষ	৪-১০
প্রকৃতির স্থায়ী উন্নয়ন	সঞ্জিত কুমার মণ্ডল	১১-১৬
বাস্তুতন্ত্রে গঠন ও কার্যকারিতা	মৈত্রেয়ী পন্ডা	১৭-২২
বাস্তুতন্ত্র- ধারণা ও বন বাস্তুতন্ত্র	মানস চক্রবর্তী	২৩-২৮
তৃণভূমি অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র	বিপ্লব মজুমদার	২৯-৩২
মৃত্তিকা ক্ষয় ও সংরক্ষন	সুজাতা মাইতি	৩৩-৫৩
মরুকরণ: - বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা	পার্থ প্রতিম প্রামানিক	৫৪-৬২
বনচ্ছেদনের কারণ ও পরিবেশের ওপর প্রভাব	অভিষেক মুসিব	৬৩-৭০
বনচ্ছেদন: কারণ ও জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব	দশরথ হালদার	৭১-৭৭
জনজাতি ও উপজাতির উপর বনচ্ছেদনের প্রভাব	সুদীপ্তা মাহাত	৭৮-৮৬
জল: ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলের অত্যধিক ব্যবহার ও অপচয়	ড. গোবিন্দ দাস	৮৭-৯৪
পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুই দিক বন্যা ও খরা	নিবেদিতা অধিকারী	৯৫-১০৩
শক্তি সম্পদ- পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও অপুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি	সুব্রত কুমার সেন	১০৪-১১০
বিকল্প শক্তিসম্পদ	মানিক দাস	১১১-১১৭
ভারতের স্থানীয় ও বিপন্ন প্রজাতি সমূহ	সন্তু ঘোড়াই	১১৮-১২৩
জীববৈচিত্র্যের সংকট: বাসস্থানের ক্ষতি, বন্যপ্রাণী শিকার, মানুষ বন্যপ্রাণী সংঘাত, জৈবিক আক্রমণ	অঞ্জলী জানা সেনাপতি	১২৪-১৩৩
বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য : পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, নান্দনিক এবং তথ্যগত মান অন্বেষণ	দেবদুলাল মান্না	১৩৪-১৩৭

পরিবেশ দূষণ ও তার কারণ, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ	সোমা মিশ্র	১৩৮-১৪৫
ভারতে জল দূষণ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব	শুভেন্দু জানা	১৪৬-১৫১
জীবজগতের উপর মাটি দূষণের প্রভাব এবং এর থেকে মুক্তির উপায়	ড. মৃণাল কান্তি সরেন	১৫২-১৫৭
শব্দ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার	সম্পা দে	১৫৮-১৬৩
পারমাণবিক দুর্যোগ এবং মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকি	প্রীতম পাত্র	১৬৪-১৬৮
ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা	ড. বিপ্লব দত্ত	১৬৯-১৭৬
বিশ্ব-উষ্ণায়ন এবং কৃষি ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব	দেবলীনা দে	১৭৭-১৭৯
ওজোন স্তরের অবক্ষয় এবং কৃষি ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব	আশিষ রানা	১৮০-১৮৪
অ্যাসিড বৃষ্টি: মানব সম্প্রদায় এবং কৃষির উপর প্রভাব	রবিশঙ্কর প্রামাণিক	১৮৫-১৯০
পরিবেশ আইন: পরিবেশ সুরক্ষা আইন	ড. মিঠুন ব্যানার্জী	১৯১-১৯৯
বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন	মিলন মাজী	২০০-২০৪
মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধি: পরিবেশ, মানব স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর প্রভাব	তনুশ্রী মাইতি	২০৫-২১৯
বন্যার কারণ ও প্রতিরোধ	বীতশোক সিংহ	২২০-২২৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ভূমিধস	ববিতা ভুঁইয়া	২২৪-২৩৩
চিপকো আন্দোলন	মন্টু সাহু	২৩৪-২৩৬
সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন	অর্পিতা ত্রিপাঠী	২৩৭-২৪০
বিশনয় সম্প্রদায় ও পরিবেশ আন্দোলন	ড. শত্রুঘ্ন কাহার	২৪১-২৪৭
পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র : পরিবেশ সংরক্ষণ ভারতীয় ধর্ম এবং অনান্য সংস্কৃতির ভূমিকা	ড. উদয়ন ভট্টাচার্য	২৪৮-২৫৯

ভারতের স্থানীয় ও বিপন্ন প্রজাতি সমূহ

সন্তু ঘোড়াই

গত দশ বছরে যেসব প্রজাতির ৭০% বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের বিপন্ন প্রজাতির তালিকাভুক্ত করা হয়। যেসব প্রজাতির গত দশ বছরে ৯০% বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের সংকটপূর্ণ বিপন্ন প্রজাতি বলে। আবার যেসব প্রজাতির আর কোন অস্তিত্বই নেই, যাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে পুরোপুরিভাবে শেষ হয়ে গেছে তাদের বিলুপ্ত প্রজাতি বলে। বর্তমান মানুষের হস্তক্ষেপে ও যথেচ্ছ হারে সম্পদের অপব্যবহারের ফলে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। ফলস্বরূপ অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি অবলুপ্তির পথে। জীব – বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের জন্য THE INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE দ্বারা বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা রেড ডাটা বুকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ১৯৬৪ সালে প্রথম IUCN দ্বারা প্রথম রেড ডাটা বুক (আই.ইউ.সি.এন. লাল তালিকা) প্রকাশিত হয়। এই বইতে প্রধানত বিপন্ন, বিলুপ্ত, সংকটজনক এবং বিরল প্রজাতিভুক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে এই পুস্তকে প্রায় ৭৭৩০০ এর বেশি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমি এখানে ভারতের কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতি প্রাণীর বিষয়ে আলোচনা করব। ভারতে আপাতত ৭৩টি প্রজাতির প্রাণীকে বিপন্ন বলে গণ্য করা হয়। রাজ্যসভায় একথা জানিয়েছিলেন পূর্বতন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী অশ্বিনীকুমার চৌবে। 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার' শীর্ষক একটি রিপোর্টের নিরিখে তিনি একথা জানিয়েছিলেন। এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে একটি বড় অঙ্ক। এখানে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, মাছ, পাখিদের তালিকা করা হয়েছিল।

নিম্নে বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর তালিকা দেওয়া হল- এশিয়াটিক সিংহ (প্যানথেরা লিও পারসিকা), ভারতীয় বন্য গাধা বা খুর (ইকুস হেমিওনাসখুর), এশিয়াটিক বন্য কুকুর বা ঢোল (কুওন আলপিনাস), এশিয়াটিক কালো ভাল্লুক (উরসাস থিবেটানাস), বেঙ্গল টাইগার (প্যানথেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস), হিমালয় ব্রাউন ভাল্লুক (উরসাস আক্টোস ইসাবেলিনাস), মেঘাচ্ছন্ন চিতা (নিওফেলিস নেবুলোসা), এশিয়াটিক বন্য বিড়াল (felis lybica ornata), গঙ্গা নদীর ডলফিন (প্ল্যাটানিস্তা গাঙ্গেটিকা), গোল্ডেন লাঙ্গুর (ট্রাকি পিথেকাস গি), ভারতীয় গন্ডার (Rhinoceros unicornis), ভারতীয় নেকড়ে (ক্যানিস

লুপাস প্যালিপস), হিমালয়ান কস্তুরী হরিণ (মশাস ক্রিসোগাস্টার), ভারতীয় হাতি (Elephas maximus indicus), গোল্ডেন জাকল (ক্যানিস আরিয়াস), ভারতীয় চিতাবাঘ (প্যানথেরা পারডাস ফুসকা), লালশিয়াল (ভালপেস ভালপেস মন্টানা), লালপাণ্ডা(আইলুরাস ফুলজেনস), স্লথ ভাল্লুক (মেলরসাস উরসিনাস উরসিনাস), তুষার চিতা (প্যানথেরা আনচিয়া), তিব্বতি বন্য গাধা (ইকুস কিয়াং) ইত্যাদি।

এছাড়া সংকটপূর্ণ বিপন্ন কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী হল– বেঁটে শূকর (হিমালয়ের পাদদেশে বসবাস), আন্দামানের সাদা দাঁতযুক্ত ইঁদুর, নিকবর দ্বীপপুঞ্জের সাদা দাঁত যুক্ত ইঁদুর, গন্ধগোকুল (মালাবার উপকুলে পশ্চিমঘাট অঞ্চলে) ইত্যাদি ।

সরীসৃপ –

Gharial (গঙ্গা, সিন্ধুনদী, ব্রহ্মপুত্র নদী, গোদাবরি এবং বরাকর নদীতে এদের বসবাস), Hawksbill turtle (ভারতের পূর্ব উপকুলে এদের পাওয়া যায়), Leatherback turtle (ভারতের পূর্ব উপকুলে এদের পাওয়া যায়), River terrapin (পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এবং ওড়িশা তে এদের পাওয়া যায়), এবং Bengal roof turtle (উত্তর পূর্ব ভারতে এদের পাওয়া যায়), এছাড়া রয়েছে পিট ভাইপার। এইগুলি প্রত্যেকটিই সংকটপূর্ণ বিপন্ন সরীসৃপ।

মাছ-

যে সব প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অচিরেই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবিলা করছে তাকে সংকটপূর্ণ বিপন্ন প্রজাতির মাছ বলে। Pondicherry Shark (ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়), Ganges Shark (গঙ্গা নদী ও তার শাখা নদীতে পাওয়া যায়), Knife tooth sawfish (আরব সাগরে পাওয়া যায়), Large tooth sawfish (ক্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাস) ইত্যাদি। এছাড়া কিছু বিপন্ন প্রজাতির মাছ আছে। এগুলি হল চিতল, টেংরা, কানিপাবদা, মধু- পাবদা, কালাবাটা, খোলসা, পাঁকাল, সরপুঁটি, বোয়াল, চেলা ইত্যাদি।

পক্ষী-

ভারতের এক নতুন গবেষনায় দেখা গেছে দেশটিতে পাখির সংখ্যা অনেক দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে চলে গেছে। প্রায় ৮৬৭ প্রজাতির পাখি সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি প্রজাতির পাখি বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বিপন্ন পাখিদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় বেঙ্গল ফ্লোরিকানের। এই পাখির বাসস্থান ভারত ও নেপালের তৃণভূমিতে। এরা অত্যন্ত লাজুক

প্রকৃতির হয়ে থাকে। অপর একটি হল ফরেস্ট আউলেট। ভারতের মধ্যপ্রদেশের শুষ্ক বন জঙ্গলে থাকে এই পাখি।

এছাড়া অন্যান্য বিপন্ন কিছু পক্ষী হল চড়ুই, হোরিয়াল ইত্যাদি। তবে কিছু সংকটপূর্ণ বিপন্ন পক্ষী প্রজাতি হল– বেয়ারের ভূতিহাঁস (ভারতের উত্তর পূর্ব দিকে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশায় এদের বাস), গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড (গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে এদের বাস), সাইবেরিয়ান ক্রেন (পরিযায়ী এই পাখিটি নাগপুরের দক্ষিনাংশে ও পূর্ব বিহারে মূলত ভরতপুর বার্ড স্যাঞ্চুয়ারিতে দেখা যায়), white backVulture (সমগ্র ভারতে), Red headed Vulture (ভারতের মহারাষ্ট্র, কেরালা, গোয়া, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অসম প্রভৃতি রাজ্যে এদের পাওয়া যায়), Slender billed Vulture (গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরে, হিমাচল প্রদেশ, সমগ্র অসমে এদের পাওয়া যায়), Pink headed duck (ওডিশা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশে এদের বাস) এছাড়া Himalayan quail (উত্তরাখণ্ড, উত্তর পূর্ব ভারতে এদের বাস)।

এই সমস্ত প্রাণীগুলি নানা কারণে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ বিভিন্ন প্রাণীকে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন- মাছ, কচ্ছপ, পাখি, কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী ইত্যাদি। খাদ্যের প্রয়োজনে এই সকল প্রাণীদের নির্বিচারে হত্যা করার জন্য তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি বন্যপ্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে প্রচুর মূল্যে। কুমির, গন্ডার, বাঘ, হরিণ এই সকল প্রাণীদের ব্যাপক হারে চোরা শিকার করা হচ্ছে। ফলে এরা এখন বিলুপ্তির পথে দাঁড়িয়ে আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বনাঞ্চল উচ্ছেদ করে শস্যক্ষেত্র, নগর ও শহর পত্তন হয়েছে, শিল্পাঞ্চল স্থাপনের ফলে বন্যপ্রাণী আজ বিলুপ্তিরপথে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের আগে রাজা-মহারাজারা নিছক চিত্ত বিনোদনের জন্য অসংখ্য বন্যপ্রাণী নিধন করে উল্লোসিত হতেন। এখনও চোরাশিকারিরা অর্থোপার্জনের লোভে বহু বন্যপ্রাণী নির্বিচারে হত্যা করে। এছাড়া অপরিকল্পিতভাবে গাছ কেটে ফেলার জন্য প্রাণীদের আবাসস্থল এবং প্রজনন স্থলের অভাব ঘটে। ফলে প্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না।

প্রাকৃতিক কারণেও বন্যপ্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে থাকে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বহু বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান গবেষণা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে অধ্যয়নের সময় মাছ, ব্যাঙ, হাঙ্গর, গিরগিটি, গিনিপিগ, বানর ইত্যাদি প্রাণীদের নিধন করা হয়। এমনকি এটাও দেখা গেছে যে, কোন স্থানে নতুন প্রজাতির জীবের প্রতিপালনের জন্য পুরনো প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা

হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যেমন- নতুন করে কুকুর ও শুকরের প্রতিপালনের জন্য মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের ডোডো (Dodo) পাখির বিলুপ্তি ঘটেছে। এছাড়াও কীটনাশক, ডিডিটি, ছত্রাকনাশক, আগাছা নাশকের প্রয়োগের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ভাবে এবং সচেতনতার অভাবে পশু চিকিৎসকরা এক ধরনের ব্যাথানাশক (ডাইক্লোরোফেনাক) ব্যবহার করাতে আমাদের খুবই পরিচিত পক্ষী শকুন প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। গ্রাম বাংলায় আমরা ছোটবেলায় যে প্রচুর শকুন দেখেছি, আজ আর সেই গুলি দেখতে পাই না।

কিন্তু বন্যপ্রাণী প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। শকুন যক্ষা, এনথ্রাক্স ইত্যাদি রোগাক্রান্ত মৃতপশুর মাংস খেয়ে পরিবেশকে জীবাণুমুক্ত করে। বিভিন্ন প্রাণীজ সম্পদ ও অতিরিক্ত বন্যপ্রাণী বিদেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করা সম্ভব। সুন্দর সুন্দর বন্যপ্রাণী দ্বারা প্রাণী উদ্যান তৈরি করে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব। প্রানীরা বর্জ্য ও রেচন পদার্থ বিয়োজনের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য অব্যাহত রাখে। এমনকি জীবজন্তুদের নিয়ে লেখা শিশুসাহিত্য শিশু মনের বিকাশ ঘটাতে পারে। কবি, লেখক, চিত্রকরদের কাছে বন্যপ্রাণী অনুপ্রেরণা ও প্রতিভার স্ফুরন ঘটাতে সাহায্য করে।

সবচেয়ে বড় কথা পরিবেশের খাদ্যশৃঙ্খলকে স্বাভাবিক রাখতে বন্য পশুপাখির সংরক্ষণ অতি প্রয়োজনীয়।

আপনাদের অনেকের মনে আছে মাও-সে-তুং এর কথা। ১৯৪৯ সালে চীনের ক্ষমতা গেল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। চীনের অর্থনীতিকে অতি দ্রুত বদলে দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সে বছর মাও-সে-তুং 'দ্য গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' প্রকল্পের ঘোষণা করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক এ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সরকারী অর্থায়নে চাষাবাদ তথা কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী কৃষিশিল্পকে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্তকরণ। কৃষিবিপ্লবকে সফল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল তারা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাও-সে-তুং এর কাছে রিপোর্ট আসে তাদের চারপাশে বসবাসরত চড়ুই পাখির দল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসল খেয়ে ফেলে।

আর মাও-সে-তুং এ সমস্যার সমাধানে কোন চিন্তাভাবনা না করেই সব চড়ুই পাখি মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়। প্রাণীদের ব্যাপারে মাও বিশেষ কিছুই জানতেন না। তিনি কখনো নিজের পরিকল্পনা নিয়ে কারোর সাথে আলোচনাও করতেন না। আর বিশেষজ্ঞদের মতামতেরও ধার ধারতেন না। তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এদেরকে মেরে ফেলা হবে। চীনা বিজ্ঞানীদের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, এক বছরে প্রতিটি চড়ুই পাখি

খেয়ে ফেলে প্রায় ৪.৫ কেজি শস্য দানা। তাহলে প্রতি এক মিলিয়ন চড়ুই পাখি হত্যা করতে পারলে, আনুমানিক ৬০ হাজার মানুষের খাদ্য সংস্থান করা সম্ভব হবে। তাই কিভাবে চড়ুই পাখি মারা যায়, তা নিয়ে রীতিমত গবেষণাও চালানো হয়েছিল। সবখানে বেজে উঠল চড়ুই পাখির বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সরকারি অফিসের কর্মী, কারখানার শ্রমিক, কৃষক, পিপলস্ লিবারেশন আর্মি সকলেই ছুটে চলছে যুদ্ধের জয়গান গেয়ে। গৃহিণীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন থালা, বাটি, হাঁড়ি, চামচ নিয়ে। ১৯৫৮ সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল ৬৫৯,৯৪৩,০০০। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক যদি একটি করেও পাখি হত্যা করে থাকে, তাহলে সেদিন প্রাণ হারানো চড়ুই পাখির সংখ্যাটি হয়ে যায় প্রায় ৬৫৯ মিলিয়ন। চীনের এমন নির্বোধ কর্মকাণ্ডের খেসারত দিতেও বেশি সময় লাগলো না। ধেয়ে এলো প্রকৃতির নির্মম আঘাত। প্রথমত শস্যদানার পাশাপাশি চড়ুই পাখি নানা ধরনের পোকামাকড়ও খায়। চড়ুইপাখি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় জ্যামিতিক হারে বেড়ে গেল সে সব পোকামাকড়ের সংখ্যা। এতে করে ফসলের ক্ষেত ছেয়ে যেতে লাগলো ক্ষতিকর পোকামাকড়ে। ফলস্বরূপ, যে শস্য বাঁচানোর জন্য এত কিছু করা হলো, সেই শস্য গেল পোকামাকড়ের পেটে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শস্যভান্ডার খালি হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের মজুদ করা খাদ্যেও ঘাটতি দেখা দিলো। খাদ্য সংকটের মুখে পড়ল কোটি কোটি মানুষ। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ,, এ দুর্ভিক্ষ 'দ্য গ্রেট ফেমিন' নামে পরিচিত। চীনা সরকারের অফিসিয়াল নথি অনুযায়ী খাদ্য সংকটে প্রাণ হারানো মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ মিলিয়ন। চীনা সাংবাদিক ইয়ং জিসেং তাঁর 'Tombs tone:The Great Chinese Famine' বইতে ৩৬ বিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। ২০১২ সালে এনপিআরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইয়ং বলেন, সে সময় মানুষ মানুষকে খেয়েছে, এমন হাজার হাজার কেস আছে। ক্ষুধার জ্বালায় বাবা-মা তাদের সন্তানকে খেয়েছে, সন্তান খেয়েছে তার বাবা-মাকে এমন ঘটনা ছিল অহরহ। সমস্ত কিছু অনুধাবন করে রাশিয়া থেকে চড়ুই পাখি নিয়ে এসে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়।

এখানে আমার এই বিষয়টি আলোচনা করার অর্থ হল উদ্ধত্যের চূড়ায় বসে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রকৃতির নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যারা সীমা অতিক্রম করেছে, প্রতিবারই পরিণাম হিসাবে তাদের ওপর ধেয়ে এসেছে প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ। প্রকৃতি কখনোই সীমালঙ্ঘনকারীকে ক্ষমা করেনা। ভারতের যে সমস্ত বিপন্ন প্রজাতিগুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে প্রকৃতিতে প্রত্যেকটির গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার আপনার সকলেরই। নাহলে চীনের করুন ইতিহাসের দিকে আমরাও এগিয়ে যাব। এক্ষেত্রে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। আই.ইউ.সি.এন. (IUCN) দ্বারা

সংকটজনক প্রজাতির সংরক্ষণের জন্যে যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেইগুলির প্রতি সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমত, সমগ্র প্রজাতির অবস্থান ও অবস্থা বুঝে তাদেরকে সংরক্ষণের আওতায় এনে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা। বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে জীবজগৎকে রক্ষা করা। সেই সঙ্গে সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার্থে কর্মসূচি গঠন করা এবং সর্বশেষে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। আর এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ না করলে, পরিস্থিতি যে ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১) Mukhopadhyay, Ananda Deb (ed). (2003). Perspectives and issues in Environmental studies. Midnapore: Vidyasagar University.

২) ঘোষ, অনিলকুমার, (১৩ই জুলাই, ২০০৮), দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী।

৩) বসাক, বাসব, (সেপ্টেম্বর, ২০০৮), বাস্তবাদী দৃষ্টিতে প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষ, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

৪) ঘোড়াই, সন্তোষকুমার, বনিক, মোহনলাল, (ডিসেম্বর ,২০০৪), পরিবেশবিদ্যা, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী।

৫) ঘোষ, অনিল কুমার, (জানুয়ারি, ২০০৮), দিবস ভাবনায় পরিবেশ, কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী।

৬) ঘোষ, অনিল কুমার, (ফেব্রুয়ারি, ২০০৭). পরিবেশ অর্থনীতি, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী।

৭) মুখার্জি, নীলরতন, (মার্চ, ২০০১), পরিবেশবিদ্যা, কলকাতা: বাণী প্রকাশনী।

৮) ভট্টাচার্য, অমিত, (অক্টোবর, ২০০৪), চীনের রূপান্তরের ইতিহাস ১৮৪০ – ১৯৫৯, কলকাতা: সেতু।

৯) চৌধুরী, দেবপ্রসাদ, (২০১৬), আধুনিক যুগে পূর্ব এশিয়ার রূপান্তর, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি।

১০) চক্রবর্তী, শম্পা, (জানুয়ারি, ২০১৯), পরিবেশ ও বিজ্ঞান প্রানিত প্রবন্ধমালা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।